ISSN-1605-2021

লোক-প্রশাসন সাময়িকী
ষষ্ঠবিংশতিতম সংখ্যা
মার্চ ২০০৩/ ফাল্গুন ১৪০৯

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এনজিও: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

মোঃ আবুল হোসেন*

Abstract : At the moment the Government alone is unable to fulfil the demands of the people the NGOs come into the picture to fill the void. Over the past three decades NGOs have concentrated their efforts in diversified areas and played a positive role in mobilizing and organizing the poor, alleviating poverty, empowering women, conducting formal informal, basic literacy programme as well as primary education, health care, family planning, creating employment opportunities and income generating activities, disbursement of loan, relief and rehabilitation, post-disaster management, afforestation, etc. The NGOs significant role itself depicts the imporatance of NGOs in the socio-economic development of Bangladesh. It is the view of the author that existing GO and NGO cooperation should be strengthen through developing mutual trust, cooperation, Liveralising various regulatory policies in order to achieve the goal of poverty alleviation.

ভূমিকা :

সভ্যতার উষালগ্নেই মানব সমাজে নিজ উদ্যোগে মানুষ তার প্রয়োজন এবং সমস্যা মোকাবেলা করতে সচেষ্ট হয়। সময়ের ব্যবধানে সে দায়িত্ব বর্তায় রাষ্ট্র তথা সকারের উপর। পাশাপাশি আকস্মিকভাবে যেসব সমস্যার উদ্ভব ঘটে তার সমাধানের লক্ষ্যে স্থানীয় জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজ নিজ এলাকার সম্পদেও যথাসাধ্য সদ্ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এভাবে, আবহমান কাল ধরে বিভিন্ন সমাজে আর্তের সেবায় বা মানবকল্যাণে নিবেদিত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মহতী প্রয়াসের প্রতিষ্ঠানিক ও সুসংগঠিত রূপই হচ্ছে বর্তমান বেসরকারি সংস্থা বা এনজিও কার্যক্রম। এই এনজিও কার্যক্রম কালক্রমে পেশায় উন্নীত হতে থাকে। ষাটের দশক থেকে তৃতীয় বিশ্বেও দেশসমূহে (বিশেষত এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকায়) এনজিওর দ্রুত ও আকস্মিক বিস্তৃতি এবং উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তাবায়নে তাদের ব্যাপক অংশগ্রহণের বিষয়টি জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা, জাতীয় সরকার এবং বেসরকারি যৌথ উদ্যোক্তাদের মধ্যে এক নতুন দৃষ্টিভংগির জন্ম দেয়। ফলে উন্নয়শীল দেশগুলোতে উন্নয়ন কর্মসূচির নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তাবায়নের ক্ষেত্রে এনজিওরা এক ব্যাপক ভূমিকা পালন করে চলেছে।

---

* সহকারী অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

বাংলাদেশে এনজিও'র উন্মেষ ও বিকাশ :

স্বাধীনতা-পূর্ব বাংলাদেশ বা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বেসরকারি উদ্যোগ মূলতঃ মাতৃমঙ্গল, পরিবার পরিকল্পনা, মসজিদ, মিশন, মন্দির কমিটি ইত্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সত্তরের দশকে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলসমূহে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় এবং তৎপরবর্তী স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমিতে সি আর এ, কেয়ারসহ আরো কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এদেশে কার্যক্রম বিস্তৃত করে। এই কার্যক্রম প্রাথমিক পর্যায়ে দুর্যোগকালীন ক্ষতিগ্রস্ত জনপদগুলোতে খাদ্য, ঔষধ, কাপড় প্রভৃতি ত্রাণ বিতরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং উদ্বাস্তু শিবিরগুলো পরিচর্যা রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার মানসিকতা নিয়েও একাধিক স্বেচ্ছাসেবী জাতীয় সংস্থা যেমন, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং আরডি আর এস এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলো জন্ম লাভ করে। স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশে বেসরকারি সংস্থাসমূহের কর্মকান্ডে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে। ইউনাইটেড নেশন রিলিফ অপারেশন অব বাংলাদেশ (UNROB) চাচ কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান কারিতাস, অক্সফ্যাম, কুইকার সার্ভিস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ত্রাণ বা সেবামূলক তৎপরতার বাইরে উন্নয়নমুখী প্রকল্পসমূহ গৃহীত হতে থাকে। এসময় আখতার হামিদ খান কুমিল্লা মডেল শুরু করেন আইআরডিপি নামে, যা পরে বিআরডিবি নামে সরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এছাড়া পাওলো ফ্রেইরীর মডেল নিয়ে ব্রাক স্বাক্ষরতা কর্মসূচি শুরু করে এবং সাফল্য লাভ করে।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে এনজিও কি? আক্ষরিক এনজিও নন-গভর্ণমেন্টাল অর্গানাইজেশন। তার মানে যে কোন বেসরকারি সংস্থাকে এনজিও বলা যায়। সে অর্থে ক্লাব, সমিতি, ট্রেড ইউনিয়ন, আন্তর্জাতিক সংস্থা, রাজনৈতিক সংগঠন সবই এনজিও এর আওতায় পরে। সাধারণ অর্থে এনজিও বলতে বুঝানো হয় সেই সব সংস্থাকে যেগুলো উন্নয়ন বা সেবামূলক কর্মকান্ডে কোন না কোন ভাবে জড়িত থাকে। এদের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঃ (১) এসব সংস্থা আন্তর্জাতিক, জাতীয় বা আঞ্চলিকভাবে সেবামূলক, শিক্ষামূলক বা উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত থাকে (২) এসব সংস্থা ফরেন ডোনেশন ভলান্টারী একটিভিটি রেলগুলেশন অর্ডিন্যান্স ১৯৭৮ এর আওতায় সমাজ কল্যাণ বিভাগের রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত। বৈদেশিক সম্পদ বিভাগের মাধ্যমে এসব সংস্থা বিদেশ থেকে তহবিল পেয়ে থাকে (৩) এসব সংস্থা যে সব সূত্র থেকে তহবিল পেয়ে থাকে সেগুলো হচ্ছে : (ক) বিভিন্ন উন্নত পুঁজিবাদী দেশের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন ইউএসএইড, সিডা, নোরাড ইত্যাদি বা (খ) বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ত্রাণসংস্থা যেমন অক্সফাম, নোভিব, ইন্টারপেরেস, কিউসো বা (গ) বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান অথবা তিনটির সবগুলো থেকে অথবা একাধিক সূত্র থেকে (৪) এসব সংস্থা বেসরকারি হলেও সরকারি অনুমোদন নিয়েই এরা কাজ করে এবং সরকার গৃহিত পরিকল্পনা নীতির সংগে সম্পর্কিতভাবে কিংবা সরকার নিদের্শিত পথে এদের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। সরকার দ্বারা অনুমোদিত কার্যক্রম পরিচালিত হলেও এদের গঠন, কর্মসূচি, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, সংস্থার গঠন কাঠামো ভিন্নভাবে সাহায্য দাতা সংস্থা বা তাদের নিজেদের দ্বারা নির্ধারিত হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তারাই এনজিও যারা সরকারের Voluntary Social Welfare Agencies (Registration and control) Ordinance of 1961 এবং Foreign Donation(voluntary Activities) Regulation Ordinance of 1978 এর অধীনে রেজিষ্ট্রিকৃত। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এনজিও কার্যক্রম আজ ব্যাপকভাবে বিস্তৃত এবং এসব দেশের গরীব জনগণ কর্তৃক নন্দিত ও স্বীকৃত। দাতাদেশ ও সংস্থাসমূহের কাছেও রয়েছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা। ক্রমবর্ধমান হারে এজিওদেরকে অর্থ, অনুদান ও সহায়তা প্রদানই এর উজ্জ্বল প্রমাণ। (সারণি-১ দ্রষ্টব্য)

সারণি-১ : বাংলাদেশে বিদেশী তহবিল

অর্থবছর	বিদেশী তহবিল বন্টনকৃত মোট সাহায্যের শতকরা হিসাবে	অনুদান অংশের শতকরা হিসাবে
১৯৯০-৯১	৬.৮(১১৯)	১৪
১৯৯১	৭.৭ (১২৫)	১৫
১৯৯২	১১.৭(১৯৭)	২৪
১৯৯৩	১০.৯(১৭০)	২৪

বন্ধনীর সংখ্যাগুলি মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দেখানো হয়েছে।

সূত্র ঃ ইআরডি ও এনজিও ব্যুরো ডাটাবেজ।

এনজিও ব্যুরোর দেয়া তথ্যানুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশে বিদেশী সাহায্যপুষ্ট দেশী বিদেশী এনজিও'র সংখ্যা ৯৮৬ এবং এর বাইরে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিবন্ধন নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে কাজ করছে এমন এনজিও-র সংখ্যা ১৫ থেকে ২০ হাজার। (সারণি-২ দ্রষ্টব্য)

এদের কর্মসূচির বৈশিষ্ট্য সরকারি কর্মসূচির বৈশিষ্ট্য থেকে ভিন্নতর। এদের মূল লক্ষ্য দারিদ্র্য ও বঞ্চিত লোকদের মধ্যে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি, বর্তমান অবস্থা পরিবর্তনের প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি করে নিজেদের মাঝে একতা ও সংঘবদ্ধতা এবং সম্মিলিত উদ্যোগ সৃষ্টি করে মৌলিক চাহিদাগুলো পুরণের নিমিত্তে একটা গতিময়তা আনয়ন। কিন্তু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের এমন কোন ক্ষমতা নেই যে, কোন এলাকার সম্পদ বিন্যাসের জন্যে বিশ্ব- ক্ষমতার কাঠামো পরিবর্তন করে দরিদ্রদের উন্নতির অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে। তবে সচেতনতা, উদ্দীপনা, আত্মবিশ্বাস ও সংঘবদ্ধ তৎপরতা সৃষ্টি করে দরিদ্রদের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে তারা অধিক সফল- একথা আজ প্রমাণিত সত্য।

সারণি-২ : বাংলাদেশে বিদেশী তহবিল সমর্থিত এনজিও'র বিকাশ

সময়	এনজিও'র সংখ্যা		মোট
	স্থানীয়	বিদেশী	
১৯৯০ পর্যন্ত	২৯৩	৮৯	৩৮২
১৯৯০-৯১	৩৯৫	৯৯	৪৯৪
১৯৯১-৯২	৫২১	১১১	৬৩২
১৯৯২-৯৩	৫৯৬	১২৬	৭২২
১৯৯৩-৯৪	৬৮৪	১২২	৮০৬
১৯৯৪-৯৫	৮৪৮	১৩৮	৯৮৬

সূত্র ঃ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর ডাটাবেজ থেকে সংকলিত

ধনী দরিদ্র ব্যবধান: শতাব্দীর বঞ্চনা বিশ্বের মোট আয়ের তিন চতুর্থাংশ অর্থাৎ প্রায় ২০ ট্রিলিয়ন ডলার কুক্ষিগত হচ্ছে মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৬ শতাংশের পকেটে। এছাড়া বিশ্বের দরিদ্র জনগোষ্ঠির শতকরা প্রায় ৭০ ভাগই হচ্ছে নারী। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিগত দু'দশকে গ্রামীণ দরিদ্র নারীর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গেছে। মানব ইতিহাসের যাত্রা শুরু হওয়ার পর থেকে বর্তমান শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় নাগাদ যে উৎপাদন হয়েছে, ১৯৫০ থেকে ১৯৯০ সন পর্যন্ত প্রতি দশকে

গড়ে সেই পরিমাণ উৎপাদন হয়েছে। পাশাপাশি বিগত ৪০ বছরে বিশ্বে দরিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারি লোকসংখ্যা এবং ধনী দরিদ্রের ব্যবধানও দ্বিগুণ হারে বৃদ্ধি হয়েছে। প্রতিবেশগত এই ভারসাম্যহীনতা এমন পর্যায়ে পৌঁচেছে যে, মানব জাতির অস্তিত্বই আজ হুমকির সম্মুখীন। এই পরিস্থিতিতে যে প্রশ্নটি আমাদের সামনে সর্বাগ্রে চলে আসে তা হলো, সরকারি প্রশাসনকে উন্নয়নের জন্যে অগ্রহণযোগ্য বিবেচনা করে বেসরকারি কার্যক্রমকে যারা স্বাগত জানিয়েছিল তাদের কী উত্তর হবে? বেসরকারি বা এনজিও কার্যক্রমের অবকাঠামোগত যে রূপ উপস্থাপন করা হয়েছিলো তাতে করে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটা বিপ্লব সাধিত হবার কথা। কিন্তু দুর্ভাগ্য বাংলাদেশের, বাস্তবে তা হয়নি। বরং দেখা যায় ১৯৬৮ সালে এদেশে যে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ছিলো শতকরা মাত্র ২০ ভাগ তা বাড়তে বাড়তে ১৯৭৫ এ শতকরা ৩৩ ভাগে, ১৯৭৭ সালে শতকরা ৫০ ভাগ, ১৯৭৮ সালে শতকরা ৫৬ ভাগ এবং বর্তমানে তা শতকরা ৭০ ভাগে পৌচেছে। মানুষের মৌলিক অধিকার অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জনগণের যে বঞ্চনা এখনও বর্তমান, তার দায়ভার শুধু সরকারের একার নয়। এর দায় দায়িত্ব বেসরকারি সংস্থা সমূহের ওপরও বর্তায় বৈকি। কেননা, বঞ্চনা থেকে উত্তরণের প্রয়াস বা পথ-নির্দেশনা দিতে তারাও অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলো।

জীবন-মানের শ্লথগতি : কি করছে এনজিওগুলো ?

বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এনজিওরা ব্যাপক ভূমিকা পালন করে চলেছে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে যেমন, ডায়রিয়া চিকিৎসায় খাবার স্যালাইন এবং ছয়টি মারাত্মক ব্যাধির প্রতিষেধক হিসেবে টিকাদান কর্মসূচি, নারী উন্নয়ন, সঞ্চয়, শিক্ষা, বনায়ন প্রভৃতি কার্যক্রম এদেশে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছে যার প্রাণপুরুষ হলো বেসরকারি সংস্থাসমূহ। বিশ্বব্যাংক এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (আইএমএফ) সহ বিভিন্ন সংস্থার সমীক্ষা, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষন রির্পোটে বাংলাদেশে এনজিও কার্যক্রমের সবচেয়ে বড় উপকার হয়েছে গ্রামের সাধারণ গরীব মানুষের। তাদের মধ্যে সচেনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষ এখন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ সম্পর্কে সতর্ক হয়েছে। সরকারের দাবী অনুযায়ী ৬২ শতাংশ স্বাক্ষরতার হার অর্জন করার পেছনে এনজিওদের একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। পানি ফুটিয়ে খাওয়া, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার, খালি পায়ে না চলা, শাক-সবজি বেশি খাওয়া ইত্যাদি বিষয়েও মানুষ সচেতন হয়েছে। ফলে ১৯৯৮ সালে স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যায় সারা দেশ প্রায় ৩ মাস পানিতে ডুবে থাকলেও মানুষের মধ্যে কোথাও মহামারি রোগ দেখা দেয়নি। তাছাড়া ধর্মীয় কুসংস্কার অনেকাংশেই দূর হয়েছে। হ্রাস পেয়েছে বাল্য বিবাহ। গর্ভকালীন মায়ের মৃত্যু হারও কমে এসেছে। কমেছে শিশু মৃত্যুর হার ও মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে। বেড়েছে জীবনযাত্রার মান। সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও দরিদ্র দূরীকরণের বিশাল কর্মকাণ্ডে এনজিওদের ভূমিকা যথেষ্ট। কেবল বাংলাদেশেই নয়, ভারত, শ্রীলংকা, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়াসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বেসরকারি সংস্থাসমূহের আয় বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প, শিশু শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, বিশুদ্ধ পানি, সামাজিক বনায়ন, পরিবেশ উন্নয়ন সর্বোপরি বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান সামাজিক ব্যবধান হ্রাসে তাদের ভূমিকা প্রশংসনীয়। কিন্তু তারপরও আমাদের আতঙ্কিত হবার যথেষ্ট কারণ থাকে, যারা সাধারণ কাজ করার ক্ষমতা অর্জনের জন্যে প্রয়োজনীয় খাদ্যও সংগ্রহ করতে পারে না, প্রতি বৎসর আনুমানিক ১৩ থেকে ১৮ মিলিয়ন লোক যাদের বেশীর ভাগই হচ্ছে শিশু, ক্ষুধা, অপুষ্টি এবং দারিদ্রের কারণে মারা যাচ্ছে। এই মৃত্যুর হার প্রতিদিনে ৪০ হাজার কিংবা ঘন্টায় ১ হাজার ৭০০ জন। এখানেই শেষ নয়, জাতিসংঘের হিসেব অনুযায়ী চরম দারিদ্য সীমাতে নিপতিত জনসংখ্যা আগামী ৩০ বছরে আরো ৩০ কোটি বেড়ে যাবে। অর্থাৎ ২০২৫ সালে বিশ্বে ক্ষুধার্ত জনসংখ্যা ১২০ কোটি বেড়ে ১৫০ কোটিতে গিয়ে দাঁড়াবে। অন্যদিকে, মোট জনসংখ্যার নগণ্য একটি অংশ, সম্পদের

অধিকাংশই যাদের হাতে কুক্ষিগত, তারা কি পরিমাণ খাদ্য উৎসব করে তা বুঝা যায় বিগত ১৫ বছরে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক মানের মাত্র একটি হোটেল সোনারগাঁও-এ পরিবেশিত খাদ্য তালিকা থেকে, যা আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় ধনী দরিদ্রের ব্যবধান মানুষের এ পৃথিবীতে কি প্রকট আকার ধারণ করে চলেছে ক্রমাগত (সারণি-৩ দ্রষ্টব্য)। গত দশকে বাংলাদেশে গড়ে পৌনে ৫ শতাংশের মতো হারে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বাদ দেয়া হলে এ সময়ে মাথাপিছু উৎপাদন ও ৪ শতাংশের মতো বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সম্পদ যেমন বেড়েছে, বৈষম্যও বেড়েছে একই সঙ্গে। সম্পদ বৃদ্ধির উপকরণ গরীব মানুষের পরিবর্তে ধনীদের হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় এ অবস্থা দেখা দিয়েছে। ১৯৯৫-৯৬সালে দেশের সবচেয়ে দরিদ্র ১০ ভাগ মানুষের হাতে ছিল জাতীয় আয়ের ২.২৪ শতাংশ এবং ১০ শতাংশ ধনী জনগোষ্ঠীর হাতে ছিল জাতীয় আয়ের ৩৪.৬৮ শতাংশের নিয়ন্ত্রণ। ২০০০ সালে ১০ শতাংশ গরিব মানুষের হাতে জাতীয় আয় ১.৮৪ শতাংশে নেমে আসে। অন্যদিকে ১০ শতাংশ ধনীর হাতে জাতীয় আয়ের ৪০.৭২ শতাংশের নিয়ন্ত্রণ চলে যায়। মাত্র পাঁচ বছর সময়ে সর্বাপেক্ষা দরিদ্রদের তুলনায় সর্বাপেক্ষা ধনীদের আয় ৩৫.৭ গুন থেকে ৫৩.৪ গুন বেড়ে গেছে।

সারণি-৩ : সোনারগাঁও হোটেলে বিগত ১৫ বছরে পরিবেশিত খাদ্যের পরিমাণ

পানি খরচ করা হয়েছে	১,১৭০,০৬৫,১৬০ গ্যালন
মুরগীর মাংস খাওয়া হয়েছে	৯,৯০,০০০ কেজি
খাসির মাংস খাওয়া হয়েছে	৪,১৪,০০০ কেজি
গরুর মাংস খাওয়া হয়েছে	৫,২২,০০০ কেজি
মাছ খাওয়া হয়েছে	৭,২০,০০০ কেজি
ডিম খাওয়া হয়েছে	১৯১,৬২৫,০০০ টি
কলা খাওয়া হয়েছে	৫৫,৮৪৫,০০০ টি
আনারস খাওয়া হয়েছে	৬,৪৮,০০০ টি
পেপে খাওয়া হয়েছে	৫,৪০,০০০ কেজি
আলু খাওয়া হয়েছে	৮১,০০০ কেজি
বুফে লাঞ্চ সার্ভ করা হয়েছে (১৯৯০ থেকে চালু	২,৭০,০০০টি
বুফে লাঞ্চ সার্ভ করা হয়েছে	৩,৭৮,০০০ টি
ইফতার বিক্রি হয়েছে	৩০,০০০টি

উৎস ঃ সোনারগাঁও ট্যাটলার, পনেরতম বার্ষিকী, ২০০১।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কর্মরত উন্নয়ন সংস্থাসমূহের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গি ও কৌশলগত পার্থক্য রয়েছে একথা স্বীকার করে নিয়েও বলা যায়, একটি বিষয়ে সকলেই একমত যে, তৃণমূল পর্যায়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠির সংগঠন গড়ে তোলার মাধ্যমেই কেবল দারিদ্র দূরীকরণ সম্ভব। কিন্তু দারিদ্য দূরীকরণ কর্মসূচি প্রণয়ন করতে গিয়ে তারা যে টার্গেট গ্রুপ ঠিক করে অনেক ক্ষেত্রেই তা বিবেচনা প্রসূত হয় না। অর্থাৎ তারা এমন একটি শ্রেণীকে উন্নয়নের জন্য বেছে নেয়,যারা মোটামুটিভাবে উৎপাদনক্ষম এবং ঋণ নিয়ে ঋণ ফেরত দেয়ার যোগ্যতা রাখে। দাতা সংস্থা কিংবা সরকারি চাপ অথবা রাতারাতি সাফল্য দেখানোর লোভ এ সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের প্ররোচিত করে সন্দেহ নেই কিন্তু এতে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীবৃত্তের কিছু সংখ্যক লোক উপকৃত হলেও চরম দারিদ্রে নিপতিত

জনগোষ্ঠীর সিংহভাগ অনুন্নয়নের যে তিমিরে ছিলো সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। অন্ততঃ এক্ষেত্রে বলা চলে জিও এবং এনজিওর চরিত্র বা ব্যর্থতা এক এবং অভিন্ন। তা না হলে দক্ষিণ এশিয়ায় দু'দশক ব্যাপী উন্নয়ন কার্যক্রমের যে চিত্র আমরা আজ প্রত্যক্ষ করছি তা অন্যরকম হবার কথা ছিলো এবং অনিবার্যভাবে উচিৎ ছিলো কিন্তু তা হয়নি। আর হয়নি বলেই দুই দশক আগে নদী ভাঙ্গন বা অন্য কোনো কারণে দারিদ্রে নিপতিত ভাসমান জনগোষ্ঠীর হতাশ, বিষণ্ন মলিন যে অবয়ব আমাদের যন্ত্রনা দিতো, ব্যথিত করতো আজো তার খুব একটা হেরফের ঘটেনি।

এনজিও কর্মকাণ্ড নিয়ে বিতর্ক

তৃণমূল পর্যায়ে দারিদ্য বিমোচনের ক্ষেত্রে এনজিওগুলোর ব্যতিক্রমধর্মী সাফল্যের কথা আজ সর্বজনবিদিত। তবে কিছু কিছু চমৎকার সাফল্য সত্ত্বেও বাংলাদেশে দারিদ্রের উপর এনজিও কর্মতৎপরতার ইতিবাচক প্রভাব প্রত্যাশিত মাত্রার চেয়ে কম। অনেক ক্ষেত্রে তাদের কর্মকাণ্ড বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। কিছু কিছু এনজিওর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে তারা সাধারণ, অসহায়, দরিদ্র মানুষের দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে তাদেরকে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা চালায়। ঢাকাস্থ বৃটিশ কাউন্সিলে আফ্রিকার তিনটি দেশ থেকে আসা এনজিও প্রতিনিধি দল বাংলাদেশে এনজিও কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে বলেছেন, এনজিও-রা সর্বত্র ভাঙ্গছে। নারী স্বাধীনতার নামে নারীর মর্যাদা হেয় করছে। সর্বোপরি, দারিদ্য বিমোচনের নামে নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলে পুরুষের প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি করছে এবং বেকারত্বকে পুরুষকেন্দ্রিক করে পারিবারিক বিশৃঙ্খলা ও সামাজিক-অর্থনীতির ভিত নষ্ট করছে।

এনজিওগুলো অনেক সময় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে ভোটাধিকার নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন : ১৯৯৬ সালের জাতীয় নির্বাচনে এনজিও কর্মীরা ভোট প্রদানের সাথে ঋণ প্রদানের সম্পর্ক সৃষ্টি করেছে বলে কোন কোন রাজনৈতিক দল অভিযোগ করেছে। এছাড়া অনেকক্ষেত্রে অভিযোগ এনজিওসমূহ আমাদের দেশের জনগণের লোকাচার পরিবর্তন করে পাশ্চাত্যমুখী জীবন-যাপনে অভ্যস্ত করাতে চায়। এনজিওসমূহ বিভিন্ন অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট থেকে এদেশে পুঁজিপতি সৃষ্টি করেছে এবং নারী উন্নয়নমূলক পদক্ষেপসমূহ অনুসরণ করে এদেশের মূল্যবোধ পরিপন্থি কার্যক্রম অবলম্বন করেছে। যা উন্নয়নের পরিবর্তে সামাজিক অবনতিশীল কর্মপ্রক্রিয়া গ্রহণের নামান্তর। অনেক এনজিও-এর বিরুদ্ধে এরকম অভিযোগ আছে যে, সেখানে সংস্থার অর্থ দিয়ে অবৈধভাবে গাড়ী বাড়ী ভোগ দখল করছে কর্মকর্তারা। ব্যক্তিকেন্দ্রিক এসব প্রতিষ্ঠানে দু'একজন কর্মকর্তা কোটি কোটি টাকা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কোটিপতির অবস্থান লাভ করছে। অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছে যে, সংস্থার মধ্যে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগে অনেক কর্মী সংস্থা থেকে বেরিয়ে এসেছেন; আবার এরকম ঘটনাও ঘটেছে যে, দুর্নীতির দায়ে বা অন্য কোন কারণে কাউকে কাউকে বহিস্কার পাল্টা বহিস্কার করা হয়েছে। সংস্থা ভেঙ্গে দুই বা ততোধিক সংস্থায় পরিণত হযেছে। বক্তিকেন্দ্রিক এসব প্রতিষ্ঠানে চরম ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে কর্মীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার নির্যাতন ইত্যাদি করা হয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশে কর্মরত কিছু এনজিও'র বিরুদ্ধে অর্থের অপব্যবহার, দুর্নীতি ও প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ-সুইডিশ ফ্রি মিশন' ৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার বাজেটে ৫ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় দেখিয়েছে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর এক রিপোর্ট অনুযায়ী- ৫০টি এনজিওর বিরুদ্ধে সরকারের অনুমতি ব্যতিরেকে ১.৪ বিলিয়ন টাকা সংগ্রহের অভিযোগ রযেছে। এবং এই রিপোর্টে আরো জানানো হয় যে, এনজিওগুলো বৈদেশিক সাহায্যের শতকরা ৬০ ভাগ অর্থ প্রশাসনিক খাতে ব্যয় করছে। ঋণ আদায়ে কঠোরতা অবলম্বনের যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছে জাতীয় শীর্ষ স্থানীয় কিছু এনজিও তাতে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠিগুলো সুযোগ পেয়েছে এ থেকে ফায়দা লুটার। এসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে

দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর দ্বারা এনজিওগুলো প্রতিরোধের সম্মুখীনও হয়েছে, এমনকি কার্যক্রমের প্রতিবাদে দেশে হরতাল পর্যন্ত পালিত হয়েছে।

বাংলাদেশে শহর এবং গ্রাম দু'জায়গাতেই চরম দারিদ্র অবস্থা বিরাজমান থাকলেও পল্লী এলাকায় দারিদ্রেও ঘনীভবন অতিমাত্রায়। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় পল্লী এলাকার ৫৩.১০ শতকরা মানুষ যেখানে দারিদ্যসীমার নিচে বাস করে সেখানে শহরের দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারীর সংখ্যা ৩৬.৬০ শতাংশ। এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর ডাটাবেজ থেকে দেখা যায় যে, উন্নয়ন এনজিওগুলোর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে দেশের প্রশাসনিক রাজধানীতে অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কেন্দ্রীভূত রয়েছে (সারণি-৪) । এর ফলে একই কাজের পুনরাবৃত্তি ঘটছে যা এসব প্রতিষ্ঠানগুলোর পরস্পরের মধ্যে অযথা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে সাহায্য করছে।

সারণি-৪ : এনজিওগুলোর আঞ্চলিক অবস্থান
১৯৯০-৯৫ (রেজিষ্ট্রেশনের অবস্থান অনুসারে)

বিভাগ	১৯৯০	১৯৯১	১৯৯২	১৯৯৩	১৯৯৪	১৯৯৫	মোট ১৯৯০-৯৫	মোট জনসংখ্যা %
ঢাকা	৪৩	৮৯	৬৭	৬৯	৫৮	১৮	৩৪৪(৬০)	৩১
রাজশাহী	১৭	২৫	১১	১৪	৯	৮	৮৪ (১৪)	২৪
খুলনা	১০	১৮	৫	১৪	২	২	৫১ (৯)	১২
বরিশাল	১০	৮	৪	৬	৬	৩	৩৭ (৬)	৭
চট্রগ্রাম	১০	১১	১৮	৫	৫	৬০ (১০)	২৬	
মোট	৯০	১৫১	৯৮	১২১	৮০	৩৩		১০০

দ্রষ্টব্য : বন্ধনীয় সংখ্যাগুলো দিয়ে শতকরা হিসাব দেখানো হয়েছে।

সূত্র : এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এবং স্ট্যাটিসটিকাল ইয়ার বুক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সাফল্য ব্যর্থতার পরিসংখ্যান নয়, প্রয়োজন উত্তরণ

উন্নয়ন এবং দারিদ্য বিমোচন প্রত্যয় দুটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ভোটের রাজনীতি যারা করেন তাদের একটি দায়বদ্ধতা থাকে এ দুটোর প্রতি। এদিক থেকে এনজিগুলো মুক্ত। কিন্তু এনজিওগুলো যেহেতু মানবিক মূল্যবোধে তাড়িত হয়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিজেদের সম্পৃক্ত করে সেক্ষেত্রে, নিজের বিবেকের কাছে জবাবদিহিতার প্রশ্নটি থেকে যায়। যে মহাজনী মূল উৎপাটনের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে মানবতার লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অবমাননা থেকে উত্তরণের অভিপ্রায় নিয়ে এনজিওগুলো তাদের কর্মসূচির ব্যাখ্যা দেয় অনেক ক্ষেত্রে তারা নিজেরাই এর চোরা বালিতে পথ হারায়। দেশের রাজনীতিতে পরোক্ষ হস্তক্ষেপ কিংবা দাতা দেশগুলোকে প্রভাবিত করে সরকারকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য করার অভিযোগও একাধিকার উত্থাপিত হয়েছে বেসরকারি সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে। এতে এনজিও এবং সরকারের অভিন্ন লক্ষ্য, দারিদ্র বিমোচন তথা উন্নয়ন হলেও পরস্পরের কাজের ক্ষেত্র বা পদ্ধতি নিয়ে মতবিরোধ তুঙ্গে উঠেছে। ফলে মুখ থুবড়ে

পড়েছে উন্নয়ন কার্যক্রম। আর ভোগান্তি বেড়েছে দরিদ্র মানুষের, যারা রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামায় না, পক্ষ বিপক্ষ বুঝে না, দু'বেলা দু'মুঠো খাবারের সংস্থান হলে এটাকেই পরম পাওয়া বলে মনে করে নিজের ভাগ্যকে সাধুবাদ জানায়। অথচ ভাগ্যের হাতে মার খাওয়া এসব সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশাকে পুঁজি করে এদেশের রাজনীতিবিদ, উন্নয়নবিদরা নোংরা নির্লজ্জ দরকষাকষিতে মেতে ওঠে বিদেশী সেই সব প্রভুদের সঙ্গে, যারা কখনই চায় না এদেশ চিরতরে দারিদ্য থেকে মুক্তি লাভ করুক। কারণ দারিদ্রের সঙ্গে বাণিজ্যের একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। দারিদ্রের বিদায় মানে বাণিজ্যের পরিসর্মাপ্তি। ১৯৮৩ সালে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জর্জ শুলজ এ বক্তৃতা করেছিলেন, "উন্নয়নশীল দেশসমূহের কেবলমাত্র ১৯৮০ সালে যুক্তরাষ্ট্র ৫৮০ বিলিয়ন ইউএস ডলার মূল্যমানের পন্য রপ্তানী করেছে যা ঐ সমস্ত দেশে প্রদত্ত সর্বপ্রকার আর্থিক সহায়তার সতেরো গুন বেশি। দারিদ্রে নিপতিত, নিরক্ষর, অজ্ঞ, সাধারণ মানুষের মিঃ শুলজ এর এই বক্তৃতার মর্মবাণী উপলব্ধি করার ক্ষমতা নেই। এটা উপলব্ধি করতে হবে তাদেরকেই যারা নিজেদেরকে এদেশের হর্তা-কর্তা, ভাগ্য বিধাতা ভাবতে অভ্যস্ত। কাজেই আত্মগরিমা, অহংকার আর বাগাড়ম্বরের শৃঙ্খলে আবদ্ধ না থেকে কিংবা একে অপরের সাফল্য-ব্যর্থতার পরিসংখ্যান না ঘেঁটে দুঃসহ দারিদ্য থেকে উত্তরণের উপায় বের করতে হবে সেইসব মানুষের জন্য যারা আমাদের ওপরে ওঠার সুযোগ করে দিয়েছে।

উপসংহার

এনজিও ও সরকারের মধ্যে সহযোগিতার দৃষ্টান্ত বিরল-টাস্ক ফোর্স প্রতিবেদনে বলা হয়েছে এ কথা। একদিকে এনজিওগুলোর তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা এবং সফলতা অন্যদিকে সরকারি প্রশাসনের সীমাহীন দুর্নীতি এবং উন্নয়নকে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌছে দিতে ব্যর্থতা পরস্পরের মধ্যে একটা অসহযোগিতার, অসহনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। (সারণি-৫)

সারণি-৫ : সরকার এবং এনজিও – পারস্পরিক উদ্বেগ

সরকার মনে করেন যে এনজিওগুলোর	এনজিওসমূহ মনে করে যে সরকার
জবাবদিহিতার অভাব রয়েছে	অনমনীয়, আমলাতান্ত্রিক এবং এনজিওর কার্যক্রম মাত্রারিক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চান।
আন্তঃ এনজিও সমন্বয় অপ্রতুল	বিদেশী অর্থায়ন সমর্থিত প্রকল্পে অহেতুক পূর্ব অনুমোদন চান।
কার্যক্রমের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করে	এনজিওর প্রকল্প ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ ও রীতি ভিন্নতর।
বিদেশী তহবিলের ওপর নির্ভরশীলতার খুব বেশি	এনজিওর প্রকল্প ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ ও রীতির পার্থক্যকে মূল্যায়ন করেন না।
	পরীক্ষিত, সাফল্যের অধিকারী এনজিও এবং কম অঙ্গীকারাবদ্ধ এনজিওর মধ্যে প্রভেদ নির্ণয় করেন না।

সূত্র : জরিপ রিপোর্ট – "বাংলাদেশে এনজিও'র ভূমিকা ও প্রভাব মূল্যায়ন" এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, ১৯৯২।

তাছাড়া এনজিওগুলো তাদের কর্মনৈপুণ্য, সংবেদনশীল মনোভাব এবং গ্রহণযোগ্য আচরণের মাধ্যমে দাতা দেশ বা সংস্থাগুলোর যে আস্থা ও সুনাম অর্জন করেছে সরকার কার্যতঃ তাতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে ঈর্ষাকাতর হওয়াটাই স্বাভাবিক এবং ঘটছেও তাই। অনেক ক্ষেত্রে সরকার এনজিওগুলোর কাজের অবমূল্যায়ন করে থাকে কিংবা এমন সব সিদ্ধান্ত প্রদান করে যা আপাতঃ দৃষ্টিতে সাংবিধানিক মনে হলেও প্রকারান্তরে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশের জনগণের ঐ বৃহত্তর অংশটি যাদের জীবন ধারণের মৌলিক উপাদনগুলোর সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য সরকার নৈতিক বা সাংবিধানিকভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ। কাজেই কর্তৃত্বমূলক মনোভাব পরিহার করে অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার কথা বিবেচনা করে স্বাধীনভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সুযোগ যাতে এনজিওগুলো পায় সে ব্যাপারে সরকারকে আরো বেশি আন্তরিক হতে হবে। লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য যদি হয় দারিদ্র্য বিমোচন তথা সাধারণ মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন তাহলে এনজিও বিতর্ক না তুলে এক প্রাণ এক মন নিয়ে কাজ করতে অসুবিধাটা কোথায় ?

তথ্য নির্দেশিকা

John G. cull and Richard E. Hardy, (1974) Volunteerism; An Emerging Profession, Illinois, U.S.A

মুহাম্মদ আনু, বাংলাদেশে উন্নয়ন সংকট এবং এনজিও মডেল, প্রচিন্ত প্রকাশনী ১৯৮৮ ।

আহমেদ তোফায়েল (১৯৯৮), "সংসদে প্রশ্নোত্তর" সংবাদ, ১৩ মার্চ ১৯৮৪.

হোসেন মোঃ আবুল ও হোসেন মোকাম্মেল " বৈদেশিক সাহায্যের সৃঙ্খলে আবদ্ধ বাংলাদেশের অর্থনীতি ঃ মুক্তির উপায় কি ? উন্নয়ন প্রসঙ্গ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত (১৯৯৯) গতিধারা প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা ।

হাসান মোস্তফা ও হোসেন মোঃ আবুল (১৯৯৯) প্রাগুক্ত

রতন রফিকুল ইসলাম, (২০০৩) এনজিও বনাম সরকার, অর্থ কণ্ঠ বর্ষ-৪, সংখ্যা-১৩ ।

রায় স্বদেশ (২০০৩), সাইফুরের নবম বাজেট মধ্যবিত্তের একই কষ্ট" IN যায় যায় দিন, বর্ষ-১৯, সংখ্যা ৩৫ ।

হাসান সানাউল (১৯৯০) "সরকারের আরেক মাথাব্যাথা এনজিও" মূলধারা বর্ষ ১, সংখ্যা ১৮,

বাংলাদেশ অভিন্ন অক্ষ্যের অন্নেষণ ঃ সরকার এবং উন্নয়নমুখী এনজিওগুলোর মধ্যে সম্পর্ক পুনর্বিন্যাস, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড ১৯৯৬ ।

হাসান উজ্জামান আল মাসুদ (১৯৮৫), বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়ন বিকল্প প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টা ঃ ব্যর্থতা ও সাফল্য" লোক, নভেম্বর ।

Development and Co-Operation, January –February, 1992

সরকার আব্দুল হাকিম ও মোঃ নুরুল ইসলাম (১৯৯৬), গ্রামীণ উন্নয়নে বেসরকারি সংস্থা ঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত" দি জার্নাল অব সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট, বর্ষ ১১, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ১৯৯৬, পৃঃ ২৯-৩০

মুহাম্মদ আনু, ১৯৮৮ প্রাগুক্ত

বারী ফজলুল (১৯৯০), অর্থ আত্মসাৎ, তরুণী ও শিশু পাচার এবং অভিযুক্ত বারটি এনজিও" সাপ্তাহিক পূর্বাভাস, ২৪ সেপ্টেম্বর ।

NGO Bureau (1992), NGOs in Bangladesh". NGO Affaires Bureau, Dhaka.

সম্পাদকীয় (২০০৩), দৈনিক সংবাদ, ২১ জুন ।

হাসান উজ্জামান আল মাসুদ, (১৯৮৫) লোক, প্রাগুক্ত

Larry Minear (1987), The role of Governmental Organization in Development in Poverty, Development and Food. Edited by Edward Clay and john Sham, London.